ইতিহাসের প্রেক্ষিতে এক বাংলা - দুই বাংলা

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়

বাংলাদেশের বর্তমান সাংস্কৃতিক জীবন সহ রাজনৈতিক জীবন দ্বিখন্ডিত। একটা পুব দিকে যায় তো আরেকটা পশ্চিমদিকে। একটা যদি বলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা ঘাতক ও দালালদের ভূমিকা নিয়েছিল তাকে ফাঁসি দিতে হবে[১]। অন্যটা তখন ক্ষিপ্ত হয়ে পথে নেমে পড়ে ইঁট পাটকেল প্রেট্রোলের ক্যান নিয়ে বলে তাদের মুক্তি দাও। হুমায়ুন বাগাদকে একদল বরণীয় কবি লেখক হিসাবে মান্যতা দেয়। আরেক দলের প্রতিনিধিরা তাকে আক্রমণ করে চাপাতি দিয়ে[২]। এই মানসিক দ্বৈধতা বুঝতে আমাদের একটু পেছিয়ে যেতে হবে। বাংলাদেশের জাতীয় কবি হিসাবে সম্মানিত কাজী নজরুল ইসলাম যখন কবি হিসাবে বাঙালি জাতির সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করেন তখন একদল তাকে বরণ করে মহা আনন্দে। আরেক দল বলেন, একে শূলবিদ্ধ করো। প্রমাণ স্বরূপ দুটি অভিমতের প্রকাশিত রূপ উপস্থাপিত করি—ইসলাম দর্শন (১৩২৯) পত্রিকায় মুনশী মোঃ রেয়াজুদ্দীন আহমদ নজরুল সম্পর্কে লিখেছিল—

> 'লোকটা শয়তানের পূর্ণাবতার। ইহার কথা আলোচনা করিতেও ঘৃণা বোধ হয়। দুঃখের বিষয় এক দল ধর্মজ্ঞান শূন্য মুসলমান "ধূমকেতুর" এই সকল শয়তানী ও পৈশাচিক উক্তি পাঠ করিয়া লেখককে "বাহবা" দিয়ে তাহার মাথাটি বিষম বিগড়াইয়া দিয়াছে। তাহাতে ইহার বুকের পাটা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। কলমের মুখে যা আসিতেছে, তাই লিখিতেছে। খাঁটি ইসলামী আমলদারী থাকিলে এই ফেরাউন বা নমরুদহে শূলবিদ্ধ করা হইত বা ইহার মুন্ডপাত করা হইত নিশ্চয়ই।'[৩]

অন্যদিকে মোয়াজ্জিন (১৩৩৫) পত্রিকা নজরুলকে স্বাগত জানিয়েছিল এই ভাষায়—

> 'কবি নজরুলের পূর্বে বঙ্গ-মোসলেম সমাজে কাব্য-সাহিত্যিকের অভাব অনুভব হইতেছিল, কিন্তু আজ এ-সমাজ একজন মুসলমান কাব্য সাহিত্যিকের অপূর্ব সৃষ্টি সম্পদের মহান দানে বঙ্গ সাহিত্যের আসর গৌরবান্বিত হইয়াছে দেখিয়া বুক ভরা তৃপ্তি গৌরব অনুভব করতঃ ক্রমশ প্রাণবন্ত হইয়া উঠিতেছে। ... মুসলমান সমাজ তাহার একজন ভাইকে বঙ্গ-সাহিত্যের সুউচ্চ আসনে সমাসীন দেখিয়া জাতীয় অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতেছে।'[৪]

এই দুজাতীয় মূল্যায়ন বা অভিমতকে সম্পাদক বা লেখকের ব্যক্তিগত মতামত হিসাবে ধরলে ভুল হবে। আসলে বাংলার মুসলমান সমাজের দুটি ধারার প্রতিনিধিত্ব করছে এই দু রকম বক্তব্য।

সেই দুটি ধারাকে বুঝতে হলে আমাদের আরও পেছিয়ে যেতে হবে। বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের আধুনিকতার ইতিহাস যেখান থেকে শুরু সেইখানেই রয়েছে এই দ্বিমুখী দর্শনের জঁর। বিষয়টা খোলসা করে বললে বলতে হয় বঙ্গীয় নবজাগরণের নিজস্ব ইতিহাসে জন্ম নিয়েছিল এই দ্বৈততার সংস্কৃতি। কী রকম?

উনিশ শতকের বাংলায় পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির অভিঘাতে নবজাগরণ শুরু হয় যখন, তখন হিন্দু সমাজ ও মুসলমান সমাজের মধ্যে একটা বিভাজনের অবকাশ তৈরি হয়। সময়ের সঙ্গে তাল মেলাতে পাশ্চাত্য শিক্ষাকে আগ বাড়িয়ে বরণ করেছিলেন হিন্দু সমাজ। হিন্দু কলেজ স্থাপনের (১৮১৬) মধ্যে দিয়ে তারা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি তাদের অনুরাগের নিশান উড়িয়েছিলেন। নানা কারণে মুসলমান সমাজ

তখন মুখ ফিরিয়ে থাকে পাশ্চাত্য শিক্ষার দিক থেকে। রাজার জাতির মর্যাদা থেকে যারা বিচ্যুত করেছে তাদের প্রতি বিরাগ থেকেই পাশ্চাত্য শিক্ষা থেকে দূরে থাকা। এদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষা পরিগ্রহণের ফলে হিন্দু সমাজে শুর হয়ে যায় তুলকালাম কান্ড কারখানা। প্রগতিশীলরা সমাজের রক্ষণশীলতার সমালোচনা ও সংস্কারে লিপ্ত হয়। প্রগতিশীলতা ও রক্ষণশীলতার এই দ্বন্দ্ব সমাজকে সজাগ ও গতিশীল করে তোলে। এর ফলে হিন্দু সমাজ তরতর করে অনেকটা এগিয়ে যায়। রামমোহন ডিরোজিও বিদ্যাসাগর অক্ষয়দত্ত মাইকেল মননে ও সৃজনে এঁরা হিন্দু সমাজের সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ঘটিয়ে দিতে সক্ষম হন। এই সাংস্কৃতিক আলোকোদ্ভাসকে রেনেসাঁস নামে অভিহিত করা হয়েছে।

কিন্তু সমাজ যখন অনেকখানি এগিয়ে গেছে সে সময় মুসলমান সমাজের টনক নড়ল। তাদের সমাজের অগ্রপথিকরা বোঝালেন ব্রিটিশ রাজত্বে পাশ্চাত্য শিক্ষার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা ঠিক হচ্ছে না। যে জিহাদ তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে ভারতকে দার-উল-হারার (শত্রুর দেশ) ঘোষণা করা হয়েছিল সেই তত্ত্বের ব্যাখ্যা বদলে দেওয়া হয়। কাজী আবদুল ওদুদ লিখেছেন, 1868 the year of wahabi trial may be regarded as a decisive year for the mussalmans of Bengal and India in as much as it witnesse on the one hand the dying members of melitant wahabism and on the other hand the begining of the era of mussalmans loyality to and co-operative with the British wasy of governance।[৫]

কিন্তু ততদিনে পঞ্চাশ বছর এগিয়ে গেছে হিন্দু সমাজ। শিক্ষাদীক্ষা, চাকরি বাকরি, প্রতিষ্ঠা প্রায় সবই তাদের কবজায়। এমতাবস্থায় মুসলমান সমাজ নড়ে চড়ে বসতে শুরু করল। মুসলমান সমাজে জাগরণ শুরু হল ১৮৭০ সাল নাগাদ।[৬] সভা-সমিতি, পত্র-পত্রিকা প্রকাশ, সাহিত্যচর্চা সবদিক থেকে দৃশ্যমান হতে থাকল মুসলমান সমাজের-সক্রিয়তা আত্মপ্রকাশ ও প্রতিষ্ঠার বাসনা। হিন্দু সমাজের তুলনায় প্রায় অর্ধশত বর্ষ এগিয়ে-পেছিয়ে থাকার ফলাফল হল সুদূরপ্রসারী[৭]। এই ব্যবধান হিন্দু সমাজ ও মুসলমান সমাজের মধ্যে একটা ভারসাম্যহীনতা এনেছিল।

দুটি সমাজের ঘরে বাইরে তীব্র টানা পোড়েন। টানা পোড়েনের তিনরকম ডাইমেনশন। (ক) হিন্দু সমাজের সঙ্গে মুসলমান সমাজের। (খ) হিন্দু সমাজের সঙ্গে ব্রিটিশ শাসকদের ও ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে মুসলমান সমাজের। (গ) মুসলমান সমাজের সঙ্গে মুসলমান সমাজের। একে একে টানাপোড়েন গুলির স্বরূপ দেখে নেওয়া যাক—

হিন্দু সমাজের সঙ্গে মুসলমান সমাজের স্বাভাবিক সাংস্কৃতিক ভিন্নতা ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার সৌজন্যে দুই সমাজের এগিয়ে যাওয়া পেছিয়ে পড়াকে কেন্দ্র করে নতুন করে টানাপোড়েন শুরু হল। শিক্ষা দীক্ষায় এগিয়ে যাওয়ার সূত্রে নানা সামাজিক সুযোগ সুবিধা হিন্দু সামাজের দখলে চলে যাওয়ায় মুসলমান সমাজ হীনমন্যতায় (ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স) পড়ে। তারা হিন্দু সমাজকে দেখতে থাকে ঈর্ষার দৃষ্টিতে। মুসলমান সমাজের এই পাল্টাপাল্টি মনোভাবে উচ্চমন্যতা (সুপিরিওরিটি কমপ্লেক্স) তীব্র হয় হিন্দু সমাজে। তারা মুসলমান সমাজকে দেখতে থাকে সন্দেহের চোখে—তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে। সমাজ মনস্তাত্ত্বিক এই জটিলতা পরস্পরকে দূরে ঠেলে।

দ্বিতীয় টানাপোড়েনটা তৈরি হয় ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের প্রশ্নে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে হিন্দু সমাজের অগ্রপথিকরা ব্রিটিশ শাসকদের গ্রহণ করেছিল মঙ্গলময় বন্ধু হিসাবে। কিন্তু যত দিন যেতে থাকে ততই মনে হয় তাদের যতটা মঙ্গলময় হিসাবে দেখা হয়েছিল ততটা মঙ্গলময় নয় তারা। দেশীয় শিক্ষিত শ্রেণীর প্রত্যাশা যথোচিত ভাবে পূরণ করতে তারা ইচ্ছুক নয়। তারা দেখল শিক্ষিত ভারতীয়দের কর্মোন্নতি ডেপুটি পর্যন্ত যেতে পারে। সর্বোচ্চ পদাধিকার ইংরেজদের জন্যই বাঁধা। বিদ্যাসাগর বড় জোর সহকারী ইস্কুল ইনস্টিটর হতে পারেন। বঙ্কিম হতে পারেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। ব্যাস ওই পর্যন্তই। এই অপূরণের অভিমান থেকে তারা ক্রমশ মনোযোগী হল দেশীয় সংস্কৃতি, ধর্ম, সাহিত্যের দিকে। জন্ম নেয় দেশাভিমান। প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দু মেলা। শাসক ইংরেজদের সম্পর্কে অনুরাগ যত কমতে থাকে ততই তারা হয়ে ওঠেন স্বধর্মনিষ্ঠ ও স্বদেশাভিমানী।

আর ঠিক এক বিপরীত ব্যাপারটা মাথা চাড়া দেয় মুসলমান সমাজের মনোভাবে। পেছিয়ে পড়ার ব্যাপারটা মেরামত করতে তারা ব্রিটিশ শাসকদের প্রতি পূর্বতন বীতরাগ থেকে অনুরাগের পথে চলে আসতে থাকে। এর ফলে যা হয় তা ঐতিহাসিকের ভাষায় 'As the Anglo - Muslim gulf was bridged, Hindu-Muslim gulf widened.'[৮] ব্রিটিশ শাসকরা এর পূর্ণ সুযোগ নেয়। ব্যাপারটা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি হিন্দু সমাজ ও মুসলমান সমাজের প্রতি ব্রিটিশ মনোভাবের দ্বিবিধরূপটি তাঁর ভাষায় সুচারু রূপেই ব্যক্ত করে গেছেন।

> 'আজকাল সাধারণ ভারতবর্ষীয় ইংরেজের মনে একটা হিন্দু বিদ্বেষের ভাব ব্যক্ত হইয়াছে এবং মুসলমান জাতির প্রতিও একটি আকস্মিক বাৎসল্যরসের উদ্রেক দেখা যাইতেছে। মুসলমান ভ্রাতাদের প্রতি ইংরেজের স্তনে যদি ক্ষীর সঞ্চার হইয়া থাকে তবে তাহা আনন্দের বিষয়। কিন্তু আমাদের প্রতি যদি কেবলই পিত্ত সঞ্চার হইতে থাকে তবে সে আনন্দ অকপটভাবে রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে।'[৯]

শাসক হিসাবে ইংরেজের যা করার কথা তাই করেছে। তবে সব দোষ ইংরেজের ঘাড়ে চাপিয়ে নিজেদের হাত ধুয়ে ফেলতে চান যারা রবীন্দ্রনাথ সে দলে ছিলেন না। তিনি লিখেছেন,

> 'ইংরেজ সমস্ত ভারতবর্ষের কাঁধের উপরে, এমন করিয়া যে চাপিয়া বসিয়াছে, সে কি কেবল নিজের জোরে। আমাদের পাপই ইংরেজর বল।'[১০]

এর ফলেই বঙ্গভঙ্গ শেষ পর্যন্ত যার রাষ্ট্রনৈতিক পরিণতি মুসলমানদের জন্য আলাদা একটি বাংলা-পূর্ব পাকিস্তানের জন্ম। এর ভিত্তি রচিত হয়েছিল উনিশ শতকের নবজাগরণের আভ্যন্তর কক্ষে। সে গল্পে বিস্তারিত যাওয়া নিস্প্রয়োজন।

এখন আমরা আসব তৃতীয় টানাপোড়েনের মধ্যে মুসলমান সমাজের সঙ্গে মুসলমান সমাজের একটা তীব্র দ্বন্দ্ব শুরু হয় ওই উনিশ শতক থেকে। যে টানাপোড়েন সব সমাজেই থাকে যা থেকে হিন্দু সমাজও মুক্ত ছিল না তা হচ্ছে প্রগতিশীলতার ধারা ও রক্ষণশীলতার ধারার দ্বন্দ্ব। তবে কখনো কখনো তা থাকে শীতঘুমে। কখনো বা তা পায় তীব্র আকার। রামমোহন যখন সতীদাহের মতো অমানবিক প্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করছেন, ডিরোজিও রচনা করছেন ফকির অব জাঙ্গীরা গাথাকাব্য তখন ভবানীচরণ, রাধাকান্ত দেবেরা ধর্মসভায় মিলিত হয়ে তার বিরুদ্ধে সমাজকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করছেন। সেই আইন রুখে দেবার চেষ্টা করছেন। বিদ্যাসাগর অনেক চেষ্টা করে যখন

বিধবাবিবাহের পক্ষে ৫,১৯২ জনের স্বাক্ষর মাত্র সংগ্রহ করেছেন তখন তার বিরুদ্ধবাদীরা সংগ্রহ করেছেন ৫৫,৭৪৬ স্বাক্ষর।[১১] এই দুটি পরস্পর বিরোধী ধারাকে আমি রেনেসাঁস পন্থা ও রিভাইভ্যাল পন্থা নামে চিহ্নিত করতে চাই। যাই হোক না কেন সেই পর্যন্ত শত বিরোধিতার মধ্যেও হিন্দু সমাজে রেনেসাঁস ধারার জয় হয়। দেখা দেন একজন রবীন্দ্রনাথ। বৈশ্বিক মানবতার এক পূর্ণ বিগ্রহ। কিন্তু কোনো সন্দেহ নেই হিন্দু পুনর্জাগরণবাদও তার নিজস্ব সত্তা নিয়ে জাগরুক ছিল। তবে রেনেসাঁসের আলোয় তার মুখের অন্ধকার অনেকটাই পরিস্কার হয়ে গিয়েছিল। না হলে বিবেকানন্দের কণ্ঠস্বর অন্যরকম হত।

এই দ্বন্দ্ব মুসলিম সমাজে তীক্ষ্ম হয়ে ওঠে প্রথম থেকেই। ইসলামিক ঐহিত্যবাদ ও আধুনিকতা এই দুটির মধ্যে কোনটিকে আশ্রয় করতে হবে। একদল বলছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষা, যুক্তিবাদী চিন্তা, সৌন্দর্যময় জীবন সাধনা ও মানবতাবাদী দর্শনকে আশ্রয় করতে হবে। ঐতিহ্যকে গ্রহণ করতে হবে যুক্তি ও উপযোগিতার কষ্ঠিপাথরে কষে। অন্যদল বলছিলেন মুসলিম সমাজের প্রকৃত উন্নতি ঘটাতে হলে ইসলামিক ঐতিহ্যে সম্পূর্ণ অবগাহন করতে হবে। এই দুই চিন্তাধারার ঘাত প্রতিঘাত মুসলমান সমাজের অর্ন্তকক্ষে নতুন করে তীব্রতা পায়।

নজরুল সম্পর্কে মূল্যায়নে আবাহন ও তিরস্কারের যে নমুনা আগে উপস্থাপন করেছি তা মুসলমান সমাজের এই ধারার কণ্ঠস্বর। রেনেসাঁস (জাগরণ) ও রিভাইভ্যালিজামের (পুনর্জাগরণ) এই দ্বন্দ্বে রেনেসাঁসের ধারা ক্লাইমেক্সে পৌঁছয় ১৯২৬ থেকে ১৯৩৬-এ মুসলিম সাহিত্য সমাজের বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। শিখা পত্রিকাকে আশ্রয় করে হিন্দু সমাজে শতবর্ষ পূর্বে ঘটা ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের মতো ইয়ং মুসলিম আন্দোলন ঘটে। কাজী আব্দুল ওদুদ, আনোয়ারুল কাদির, আবুল হোসেন, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল ফজল, আবদুল কাদির প্রমুখের নেতৃত্বে সেই আন্দোলন তার যুক্তি নির্ভর মানবতাবাদী সংস্কৃতিকে তুঙ্গে নিয়ে যান।[১২] নজরুল এই সময়ে (১৯২৭) বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন। তারই প্রতিক্রিয়ায় তিনি লেখেন।

চল্ চল্ চল্।
উর্দ্ধ-গগনে বাজে মাদল,
নিম্নে উতলা ধরণীতল,
অরুণ-প্রাতের তরুণ দল
চল্‌রে চল্‌রে চল্।[১৩]

অন্যদিকে মুসলিম সমাজের মধ্যে পুর্নজাগরণের যে ধারা ছিল তা ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের মধ্যে রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করেছিল। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের মধ্যে দিয়ে তার আকাঙ্ক্ষা ও সমাজ দর্শন রাষ্ট্রনৈতিক স্বাতন্ত্র্য লাভ করে।

কিন্তু মুসলমান সমাজের অভ্যন্তরে জাগরণের যে ধারা ছিল তার অবিনাশী আত্মা ভিতরে ভিতরে বহমান ছিল। ১৯৫২ র ভাষা আন্দোলনের মধ্যে তা আত্মপ্রকাশ করে। পুনর্জাগরণ প্যান ইসলামের জোম্বায় বাঙালির যে সত্তাকে মুড়ে ফেলেছিল ভাষা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে তার জাগরণী সত্তা আস্তে আস্তে বের হয়ে আসে। ১৯৫২ থেকে ১৯৭১ দীর্ঘ লড়াইয়ের মধ্যে ভাষা আন্দোলনের পথ বেয়ে বাঙালি মুসলমান

সমাজের রেনেসাঁস সত্তা নতুন ঠিকানায় উপনীত হয়। সেই ঠিকানার নাম স্বাধীন বাংলা দেশ।[১৪]

ভালো করে খেয়াল করলে দেখা যাবে পূর্ব পাকিস্তানের জন্মে জয় হয়েছিল তার রিভাইভ্যালিস্ট সত্তার স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মে জয় হল রেনেসাঁস সত্তার। কিন্তু এখানেই বাঙালি মুসলমান সমাজের কাহিনী শেষ হয়ে যায় নি। তারপরের পতন-অভ্যুদয়ের নানা ঘটনা ও রাজনৈতিক জয় পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে তার দুই ধারার অস্তিত্ব।

লেখাটা শেষ করব আমার নিজের ঢাকা ভ্রমণ প্রসূত একটি লেখার উদ্ধৃতি দিয়ে—

> দুই ঢাকার নিয়ত ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে বাংলাদেশের সংস্কৃতি। তাল ফেরতা নদীর মতো একবার এ পাশ একবার ওপাশ। একবার মুজিবর একবার জিয়াউল। একবার খালেদা একবার হাসিনা। একবার এ দেওয়ালে মাথা ঠোকা একবার ও দেওয়ালে মাথা গোঁজা। নদীময় বাংলাদেশের জীবন চলে স্রোতস্বিনী নদীর মতোই। দু পাড়ের মাঝখান দিয়ে। মাঝে মাঝেই সে তাঁর সমূহ আবেগ আক্রোশ ও স্বপ্ন নিয়ে নেমে আসে রাজপথে। রাজপথ হয়ে যায় একবুক নদী। নদী সমুদ্র হয়ে আছড়ে পড়ে। ক'দিনের জন্য ছুঁয়ে এলাম সেই জীবন নদীটি।[১৫]

এ লেখা ২০০৭ সালের। বাংলার মুসলমান সমাজের ইতিহাস দ্বিস্রোতা। বহুদিন ধরে তা প্রবহমান রয়েছে। যারা বাংলাদেশ ও তার মুসলমান সমাজকে একমাত্রিক রূপে দেখাতে চান তাদের দেখায় গুরুতর ভুল আছে। বাংলাদেশের রেনেসাঁসের ধারাটির শক্তি ও সৌন্দর্য দেখতে এলে তার পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠান ও একুশে ফেব্রুয়ারির সামনে দিয়ে দাঁড়াতে হবে। এরই মধ্যে রয়েছে তার পারিমার্জিত বুদ্ধির ঝকঝকে রূপ ও সাংস্কৃতিক সৃজনশীলতার অপার রসরহস্য।

উল্লেখপঞ্জী ও টিকা

১। ২০১৩ সালে ৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় শাহবাগে শুরু হয় শাহবাগ আন্দোলন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সংঘটিত যুদ্ধাপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধীদের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে এই আন্দোলনে বিপুল সংখ্যক মানুষের সমাবেশ ঘটে। মৌলবাদী জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবিও ছিল।

২। হুমায়ুন আজাদ (১৯৪৭-২০০৪, ১১ আগস্ট), ২০০৪ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি রাতে একুশের বইমেলা থেকে কুলার রোডে ঘরে ফেরার পথে তাকে আক্রমণ করে রক্তাক্ত করে মৌলবাদী সন্ত্রাসীরা। তিনি কোনোরকমে প্রাণে বেঁচে যান।

৩। মুনশী মোঃ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, লোকটা মুসলমান না শয়তান, 'ইসলাম দর্শন', ৩য়বর্ষ, ২য় সংখ্যা, কার্তিক, ১৩২৯।

৪। সম্পাদক মোয়াজ্জিন, নজরুল সম্বর্ধনা প্রসঙ্গে একটি কথা মোয়াজ্জিন, ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, কার্তিক ১৩৩৫।

৫। A.C. Gupta (ed), Studies in the Bengal Renaissance, Jadavpur University, 1957, p. 475

৬। আনিসজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, কলকাতা, ১৯৭১, পৃ. ৩।

৭। A.F. Salabuddin Ahmed, Social Ideas and Social changes in Bengali 1818-1835, Calcutta, 1976, p.19-profoundly affected the subsequent developments of two communities :

৮। J. Maitra, Muslim Politics in Bengali 1885-1906 Calcutta, 1984, p.6.

৯। রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, রাজা প্রজা, 'সুবিচারের অধিকার' (১৩০১) প. ব. সংস্করণ,

নভেম্বর ১৯৯০, পৃ. ২১৩।
১০। র. র. তদেব, পরিশিষ্ট, রাজা ও প্রজা সমূহ, 'ব্যধি ও প্রতিকার', পৃ. ৩৫৩।
১১। স্বপন বসু, সমকালে বিদ্যাসাগর, ১৯৯৩, পৃ. ৩৬; Legislative Deptt. Papers relating to Act. xv of 1856.
১২। খোন্দকার সিরাজুল হক, মুসলিম সাহিত্য সমাজ ঃ সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম, ঢাকা, ১৯৭৪।
১৩। 'শিখা', দ্বিতীয় বর্ষ, ১৯২৮, সম্পাদক : কাজী মোতাহার হোসেন, নির্বাচিত শিখা, সম্পাদক আবদুল মান্নান সৈয়দ, একুশে, ২০০২, পৃ. ৮৭-৮৮
১৪। শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, 'রেনেসাঁস ও বাংলার মুসলমান সমাজ', 'সুন্দরম', শরৎসংখ্যা, ৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম সংখ্যা, সম্পাদনা মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, ঢাকা, পৃ. ১১৩।
১৫। ভ্রমণ আলোচ্য ঃ বাংলাদেশের হৃদয় হতে, শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, 'দাঁড়াও পথিক বর' বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা ২০০৫-২০০৭, বাংলা বিভাগ ও খিদিরপুর কলেজ, পৃ. ৪৭-৫৭